গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কৌশলপত্র ২০০০

(বাংলা সংস্করণ)

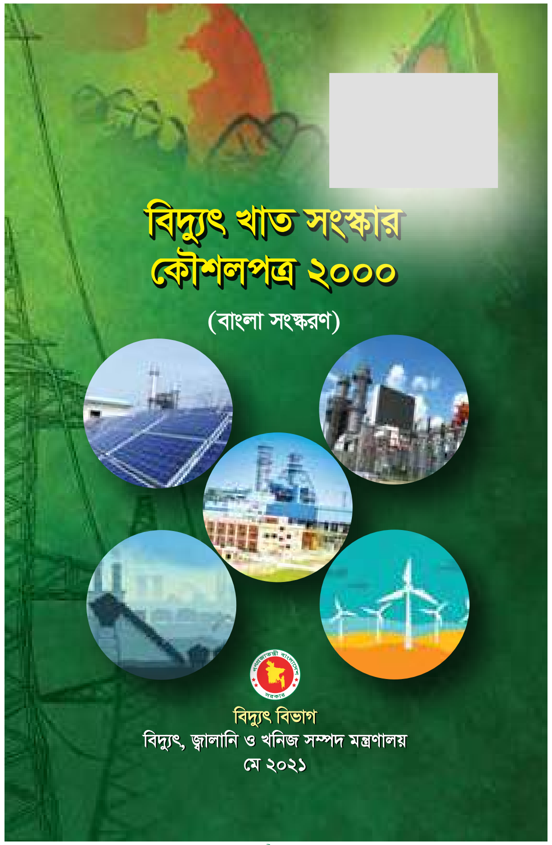

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

মে ২০২১

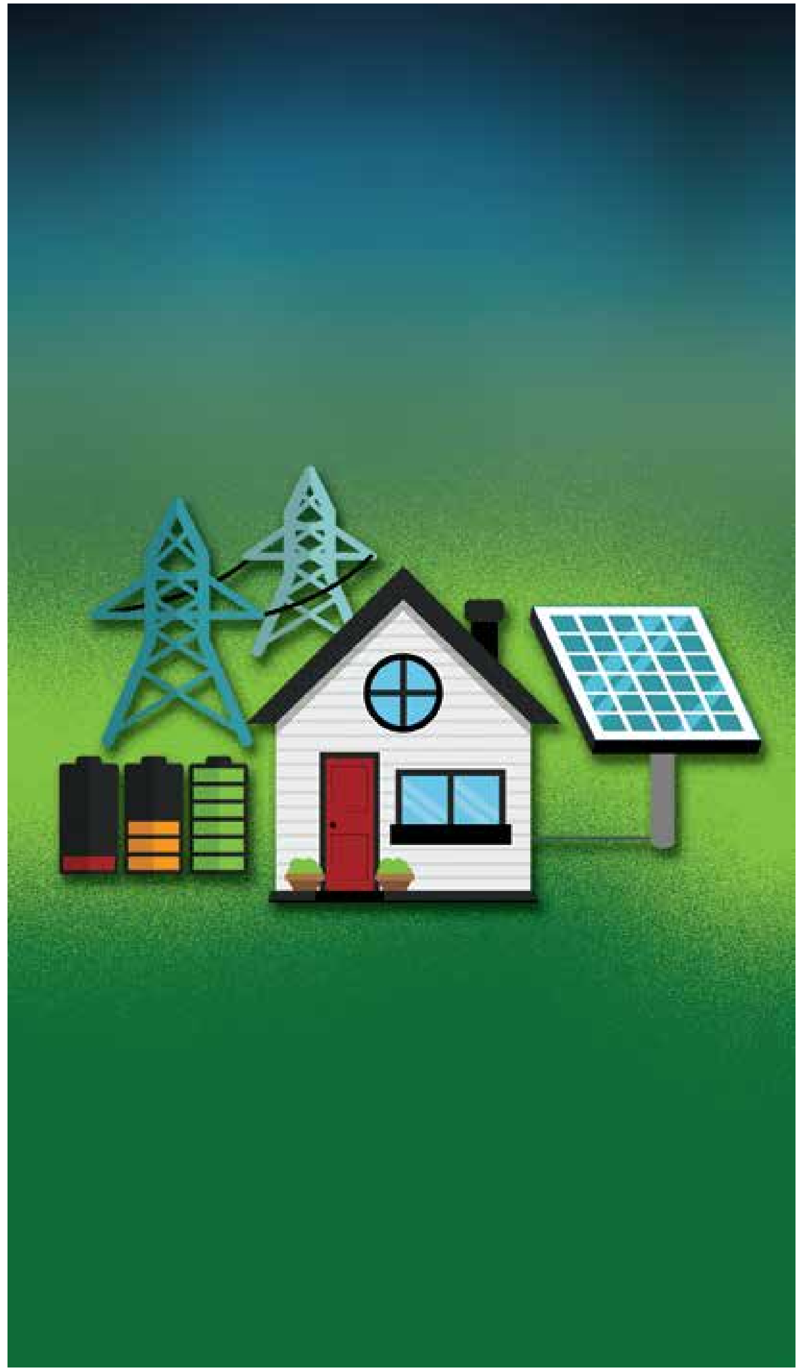

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎকে একটি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে, এ খাতের যথাযথ উন্নয়নের জন্য এসময় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং এ খাতের সকল উপাদানের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে এর সামগ্রিক কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এসময় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবহিকতায়, ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে প্রণীত হয় বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার কৌশলপত্র-২০০০। পরবর্তী সময়ে এ কৌশলপত্রের সংস্কার উদ্যোগ ও সরকারের ইতোপূর্বে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন চরমভাবে ব্যাহত হয় এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের গতি অনেকটাই হ্রাস পায়। ২০০৯ সাল থেকে সরকার পুনরায় এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২০০০ সালে এ কৌশলপত্র গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে দেশের মোট ২০% জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত ছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩৬০০ মেঃওঃ। পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২,৯৫০ মেগাওয়াটে। যার মধ্যে ব্যয়বহুল ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর স্থাপিত ক্ষমতা ছিলো ৪৫০ মেঃওঃ। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ১১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। এ সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণের সময় এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) ও অল্প সংখ্যক বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি। সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)। বিতরণ ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল ঢাকার বাইরে বাবিউবো ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ এবং শুধু ঢাকার জন্য নিয়োজিত ছিল ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)। সে সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় লোডশেডিং ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। উচ্চমাত্রায় সিস্টেম লস, বিশাল অংকের আদায়যোগ্য পাওনা এবং ট্যারিফ কাঠামো বিতরণ সংস্থাগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। যা অভ্যন্তরীণ ও

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহের মধ্যে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য, আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বায়ত্বশাসন এবং পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাব ছিল অন্যতম। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাসমূহকে বিবেচনা করে বিদ্যুৎ খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ পূর্বক তা অর্জনে এ কৌশলপত্রের আওতায় উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় খাতভিত্তিক সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে লাভজনক করে গড়ে তোলা, এখাতের বাণিজ্যিকিকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন করার বিষয়েও এ কৌশলপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সংস্কার কৌশল অবলম্বনে দেশে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ কৌশলপত্রকে ভিত্তি ধরে প্রণীত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ খাতে সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে পৃথক করে একক সংস্থা হিসেবে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশে (পিজিসিবি) কে সঞ্চালনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিতরণের জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ছাড়াও কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় গঠন করা হয় ডিপিডিসি, ডেসকো, নেসকো ও ওজোপাডিকো। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পৃথক ০৬ (ছয়) টি উৎপাদন কোম্পানি এবং কিছু জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি। বিদ্যুৎ খাতে এসব সংস্কার উদ্যোগের পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসার এবং জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের অভিলক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য

সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)। ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ শিল্পের সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলোকে কাঠামোগত নানা সংস্কার সাধিত হওয়ায় বিদ্যুৎ শিল্পের দক্ষতা ও সেবার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ২০ বছর আগে প্রণীত এ কৌশলপত্রের প্রায় সবগুলো লক্ষ্যমাত্রাই এ সময় নাগাদ অর্জিত হয়েছে। জাতীয় গ্রিডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের প্রায় শতভাগ (৯৯%) মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গত ১২ বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি হতে ১৪৯ টিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ প্রায় ২৫,২২৭ মেঃওঃ। তন্মধ্যে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ মেঃওঃ, বেসরকারি খাতে ৯,৪৭৩ মেঃওঃ এবং যৌথ অংশিদারিত্বে ১,২৪৪ মেঃওঃ। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গিয়ে, সরকার পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমানে দেশে ১,১৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। এ ধরণের বহুমাত্রিক, যুগোপযোগী এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের চর্চার কারণে খুব দ্রুতগতিতে দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বর্তমানে দেশে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় লোডশেডিং নেই বললে চলে। দেশে সামগ্রিক বিতরণ সিস্টেম লস ৮.৭৩% এ নেমে এসেছে। ২০০০ সালে প্রণীত এ কৌশলপত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশব্যাপী প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নেট মিটারিংসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা হাইড্রোসহ প্রায় ৭৩০ মেঃওঃ।

সরকারের দুরদৃষ্টি সম্পন্ন যুগোপযোগী ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে, দেশের বিদ্যুৎ খাত নানান প্রতিবন্ধকতা দূর করে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে।

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কৌশলপত্র ২০০০
(বাংলা সংস্করণ)

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
ড. সুলতান আহমেদ
সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), বিদ্যুৎ বিভাগ

সম্পাদকমন্ডলী
১) **জনাব আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান,** অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
২) **জনাব নাসির উদ্দিন তরফদার,** যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৩) **ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন,** যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৪) **জনাব এরাদুল হক,** উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৫) **জনাব তাহ্‌নিয়া রহমান চৌধুরী,** উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৬) **জনাব আইরিন পারভীন,** উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৭) **জনাব মাকসুদা খন্দকার,** উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৮) **জনাব মুহাম্মদ হাসনাত মোর্শেদ ভূঁইয়া,** সিনিয়র সহকারি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৯) **জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম,** উপপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ

সার্বিক সহায়তায়
জনাব মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কৌশলপত্র ২০০০
(বাংলা সংস্করণ)

১. সূচনা

১.১। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবার জন্য যৌক্তিক মূল্যে এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। দেশের সকলের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হলে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

১.২। ২০০০ সাল নাগাদ জনগণের বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের নিচের সারির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগেরও কম বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও অত্যন্ত নগণ্য; বৎসরে মাথাপিছু মাত্র ১১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। মাঝে মাঝে তীব্র এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছে- কোন কোন হিসাব মতে দেশের জিডিপির শতকরা একভাগ। এ পরিস্থিতি সংকটজনক, কারণ এভাবে দেশ যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তা হয়ত বাংলাদেশকে ৬-৭% জিডিপি অর্জনের সীমারেখায় নিয়ে যেতে পারতো, যার সাহায্যে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলা সম্ভব হত। তাছাড়াও নির্মাণশিল্প ও সেবা খাতে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের লভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তগুলোর একটি; সমাজ ও মানবজীবনকেও তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যুৎ চাহিদা গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি অনুভূত হয় এবং এ দাবী থেকেই বিদ্যুতের সার্বিক উপকারিতার বিষয়টি বোধগম্য। তাই ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে নির্ধারণ করা এক যথাযোগ্য জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ জ্বালানি। এক্ষেত্রে সেবিষয়টি বিশেষ সুবিধা দেবে।

১.৩। শুরুতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং সারা দেশ জুড়ে বিতরণের জন্য সমন্বিত একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), যা বিদ্যুতের উৎপাদন থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রয় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপকে একাই নিয়ন্ত্রণ করত। বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) সৃষ্টি করা হয়েছিল, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (পবিস) মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে। বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৯০ সালে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠন করা হয়। তবে কিছু মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি পূরণ করে ডেসা সৃষ্টি করতে না পারায়, এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। তবে সমস্যার সমাধান না হলেও অন্ততপক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল।

১.৪। বর্তমানে (২০০০ সাল) দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ৩৬০০ মেগাওয়াট। বছরের পর বছর ধরে পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে বর্তমানে ২৯৫০ মেগাওয়াটে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতির কিছু অংশ পুষিয়ে দিয়েছে ব্যয়বহুল ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো, সর্বসাকুল্যে তাদের স্থাপিত ক্ষমতা ৪৫০ মেগাওয়াট। ২০০০ সালের হিসাবমতে দেশে ৪.৩ মিলিয়ন গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যা ১৯৯৮-৯৯ সালের মোট জনসংখ্যার ১৬%। বাংলাদেশ সরকার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা নিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হলে, বিদ্যুতায়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০৫ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে হবে মর্মে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়। বিদ্যুৎ খাতের জন্য আগামী ৫ বছর পুঁজির প্রয়োজন কম হলেও ৫-৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে।

১.৫। এ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং ব্যবস্থার সুপারিশ করা, যা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতকে আর্থিকভাবে সক্ষম করে তোলার সাথে সাথে এর পুনর্গঠন সাধন করে একে একটি নতুন এবং মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করা সম্ভব হবে। দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের যে সম্ভাবনা আছে, সেই লক্ষ্যে এগুলো প্রণয়ন করা হবে।

২। সাম্প্রতিক বছরের সংস্কারমূলক কার্যক্রম

সরকারি খাতে সেবার মান উন্নয়নের জন্য অনুকূল এবং সক্ষম পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, দীর্ঘমেয়াদে বেসরকারি এবং বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ আকর্ষণ নিশ্চিত করা এবং ব্যয়িত অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকদেরকে যথাযথ মানের সেবা প্রদানের জন্য সরকার বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ খাতের কর্মসম্পাদনের মান উন্নয়নের জন্য একটি সার্বিক কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ লক্ষ্যে গৃহীত আরো নানা উদ্যোগের মত এ নীতিও বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের বিষয়ে একটি বৃহত্তর আঙ্গিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে, যার মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যুৎ শিল্পের বিধিগত এবং কাঠামোগত সংস্কার সাধন। এ সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলোর পরিকল্পনা করা, এদের বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান, সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পাওয়ার সেল নামক একটি পৃথক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

বিদ্যুৎ শিল্পের প্রতিটি অংশের জন্য সরকার যেসকল সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

২.১। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে প্রতিযোগিতার সূচনা, বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আনয়ন এবং সর্বোপরি তীব্র সংকট কাটিয়ে বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলিলাদি প্রস্তুত করা হয়, যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভিন্ন বিষয়াদির উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোট ১১৫৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে কিছু প্রকল্পের ট্যারিফ বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। এছাড়াও বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য ১০৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পের জন্য দর কষাকষি চলছে।

২.২। বিশেষ করে গ্রিড সংযোগ নেই এমন এলাকা এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকে এমন প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, বেসরকারি খাতে স্বল্পমাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের কাছে গ্রহণযোগ্য ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যুৎ নিকটতম এলাকার গ্রাহকদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। বেসরকারিখাতে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বাপবিবো/ পবিসের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

২.৩। প্রাথমিকভাবে ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যৌথ উদ্যোগের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ চলছে যার মালিকানায় রয়েছে বাপবিবো, পবিস এবং বেসরকারিখাত।

২.৪। আশুগঞ্জে অবস্থিত সরকারি মালিকানাধীন প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটিকে (৭২৪ মেগাওয়াট) কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার বিষয়ে এবং হরিপুরে অবস্থিত কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (৯৯ মেগাওয়াট) প্রফিট সেন্টারে রূপান্তরের বিষয়ে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপগুলোর ফলে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোয় উৎপাদন ব্যবস্থা অন্যান্য অপারেশন থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং স্বায়ত্তশাসন, প্রণোদনা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ধাপে ধাপে কোম্পানিটি কাজ শুরু করে। অন্যান্য সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে একে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; চাকুরিতে নিয়োগ এবং চাকুরি হতে বরখাস্তের ক্ষমতাসহ এর নিয়োগবিধি এবং বেতন সুবিধাদি বেসরকারি খাতের কোম্পানির সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। সরকারি বলয়ের অভ্যন্তরে নেওয়া এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম এবং এর দ্বারা একটি সংস্থার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকলেও, মূলত উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাকে সহজসাধ্য করা এবং বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ করে বেসরকারি পুঁজির প্রবাহকে আকর্ষণীয় এবং সুসংহত করা।

২.৫। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর আওতায়, ১৯৯৬ সালে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) নামক একটি সরকারি মালিকানাধীন বিতরণ সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। মিরপুর এলাকায় ডেসার অধিকারে থাকা বিদ্যুৎ বিতরণ সংক্রান্ত পরিসম্পদ প্রায় এক বছর আগে (১৯৯৫ সালে) ডেসকোর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। ডেসকোর মূল্যায়ন শেষে এর সংস্কারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৬। সকল অংশীদারের জন্য একটি সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং তাদের অংশগ্রহণের জন্য মূলনীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে পুরনো আইন ও বিধিমালার প্রতিস্থাপক হিসেবে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে একটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়। এ খসড়া আমাদের আইনী অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে এ খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে এবং আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই আইনসভায় এর বিল পাস হয়ে যাবে।

৩। বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান (২০০০ সাল) ব্যবস্থাপনা

বিদ্যুৎ খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো নিম্নরূপ:

৩.১। উৎপাদন

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
(৩) বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি

৩.২। সঞ্চালন

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(২) পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড

৩.৩। বিতরণ

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(২) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি
(৩) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
(৪) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ

৪। প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ

যে প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে মূলত বিদ্যুৎ খাতের কর্মসম্পাদন ব্যাহত, তা হচ্ছে:

৪.১। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার তা সম্পদের তীব্র সংকটের কারণে জাতীয় বাজেট থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হয় না;

৪.২। উচ্চমাত্রায় সিস্টেম লস, বিশাল অঙ্কের আদায়যোগ্য পাওনা এবং ট্যারিফ (হার এবং কাঠামো) বিতরণ সংস্থাগুলোকে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হতে এবং অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি করছে;

৪.৩। সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য, আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাব রয়েছে;

৪.৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণের দায়িত্বাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন না থাকায় খাতভিত্তিক সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে;

৪.৫। বিদ্যুৎ কেন্দ্রভিত্তিক ব্যয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রকাশ হচ্ছে না। উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ অংশের পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না।

৫। সরকারের ভিশন

৫.১। বিদ্যুৎ খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

(ক) সবার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া
(খ) বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্য এবং মানসম্পন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা
(গ) যৌক্তিক মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা

৫.২। বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার

৫.২.১। লক্ষ্যসমূহ

ভিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এদের মধ্যে আছে:

(ক) ২০২০ সালের মধ্যে সারা দেশকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করা;

(খ) বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে লাভজনক করে গড়ে তোলা, যেন তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে;

(গ) দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) বিদ্যুৎ খাতের বাণিজ্যিকীকরণ;

(ঙ) বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো এবং মান উন্নয়ন করা;

(চ) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্র ও আকৃতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ রপ্তানির সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা;

(ছ) অর্থায়নকে সচল করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;

(জ) সর্বনিম্ন মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপায় অবলম্বন করে বিদ্যুতের যৌক্তিক এবং সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করা;

(ঝ) বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার সূচনা করা।

৫.২.২ মূল উপাদানসমূহ

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং একটি যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে পূর্ববর্ণিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মূল উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কার্যক্রমকে ভিন্ন ভিন্ন সেবা হিসাবে পৃথকীকরণ করা;

(খ) বিদ্যুৎ খাতে গঠিতব্য সংস্থাগুলোকে কোম্পানি হিসাবে রূপান্তরিত এবং বাণিজ্যিকীকরণ করা;

(গ) একটি নিয়ন্ত্রণকারী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ;

(ঙ) বিতরণ ইউটিলিটিকে আর্থিকভাবে লাভজনক করা এবং বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহারকে উৎসাহিত করার স্বার্থে, উৎপাদনের ব্যয়কে প্রতিফলিত করে এমন ট্যারিফ নির্ধারণ করা;

(চ) জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধ করা;

(ছ) বিকল্প/ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন করা।

৫.৩। সংস্কার কৌশল

ভবিষ্যতের জন্য প্রণয়ন করা সংস্কার কৌশল মূলত নির্দেশিত হবে গৃহীত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, চলমান উদ্যোগের মূল্যায়ন এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে। সংস্কার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে যেগুলো সফল হবে, সেগুলোর ব্যাপ্তির প্রসার এবং অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর জন্য উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। সংস্কার কার্যক্রমের গতি এবং ক্রম কোন পূর্বনির্ধারিত ধারণা অথবা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে না, বরঞ্চ সমস্যার সমাধান করতে (ক্ষেত্রবিশেষে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে) এবং ফলাফল দানে যেন সমর্থ হয়। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর এ কার্যক্রমগুলোর জন্য সমর্থন জোরদার হবে এবং অবশেষে তাদের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

৫.৩.১। উৎপাদন

বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর দক্ষতা এবং পরিচালনার মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.৩.১.১। বিদ্যমান উৎপাদন

(ক) কর্পোরেশনে রূপান্তরিত একটি জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার অধীনে বিদ্যমান সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে পৃথক করে দেওয়া হলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতকে বাণিজ্যিক আঙ্গিকে পুনর্গঠনের পথ প্রশস্ত হবে।

(খ) বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সরকারি খাতে ভবিষ্যতে নির্মাণ করা হবে এমন সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে স্বতন্ত্র প্রফিট সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা হবে এবং প্রয়োজনীয়তা এবং যথার্থতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি হিসাবে গঠন করা হবে।

(গ) প্রফিট সেন্টার এবং বাণিজ্যিকীকরণ করা সংস্থাগুলোর মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সম্প্রসারণ, বর্ধিতকরণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৫.৩.১.২। নতুন উৎপাদন

নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যেন সর্বনিম্ন খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। সরকার মিশ্র উৎস অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি উৎস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি মূলত লিস্ট কস্ট এক্সপানশন নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে করতে হবে; এর জন্য সবচেয়ে জরুরি একটি মাস্টার প্যান, যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হবে। জরুরি ভিত্তিতে দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো হতে তরল জ্বালানিকে প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে; বঙ্গবন্ধু সেতুর সাহায্যে যমুনা নদীর ওপারে গ্যাস পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রকল্প এই উদ্যোগের একটি মাইলফলক।

৫.৩.২। সঞ্চালন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উন্নীতকরণ এবং বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধি- এ দু'টি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানো উচিত। এমন একটি দক্ষ নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা উচিত, যার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যুৎকে দক্ষতম উপায়ে সরবরাহ করে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এ উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পদ আহরণ করা আবশ্যক। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিতে রূপান্তরিত একটি সংস্থা সঞ্চালন নেটওয়ার্কের একক দায়িত্বে থাকবে এবং এই খাতের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পাদন করবে।

৫.৩.৩। একক ক্রেতা

বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যত কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষয়ে সকলেই একমত। একটি একক ক্রেতা মডেল এক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে, যে ক্রেতা ইকনমিক লোড ডিসপ্যাচের ভিত্তিতে জেনারেটর থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কিনবে এবং বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানির নিকট বিক্রয় করবে।

একক ক্রেতার কাজ

(ক) সর্বনিম্ন খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা;

(খ) এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(গ) চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (সরকারি এবং বেসরকারি) হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং চুক্তি অনুসারে তা বিতরণ সংস্থার নিকট বিক্রয় করা;

(ঘ) সর্বনিম্ন খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

এই একক ক্রেতা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হবে। শুরুতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একক ক্রেতা হিসাবে কাজ করবে যতদিন না একটি উপযুক্ত বিকল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়।

৫.৩.৪। বিতরণ

বিশেষভাবে সিস্টেম লসকে কমানোর উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর বাণিজ্যিক এবং আর্থিক উন্নয়ন সাধনের বিষয়টি এ আলোচ্যসূচির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চলমান পদক্ষেপগুলোর প্রতিনিয়ত পুনঃমূল্যায়ন করে, প্রয়োজনমাফিক সংযোজন করে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। শুরুতে মনোযোগ দেওয়া উচিত সেই স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপগুলোর ওপর, যেগুলোর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে, দীর্ঘমেয়াদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনশীল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সংস্কার কার্যক্রম চলাকালীন টেকনিক্যাল লস কমানো, বিদ্যুৎ চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সমতা সৃষ্টি এবং রিমোট রিডিং, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, বাবিউবোর বিতরণ সিস্টেমকে প্রফিট সেন্টারে বিভক্তিকরণ ইত্যাদির মত উদ্ভাবনী সমাধানের সম্ভাবনার ওপর প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হলে, বিদ্যুৎ শিল্পকে সফলভাবে পরিচালনা করা, বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি করে আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহককে সেবা দান করা সম্ভব হবে।

এ কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিদ্যুৎ বিতরণ শক্তিশালীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করা হচ্ছে:

(ক) সিটিজেন/ ক্লায়েন্ট চার্টার প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রাহকের মতামত গ্রহণের এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) বাবিউবো এবং ডেসার বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় নতুন কোম্পানি সৃষ্টি করা;

(গ) বিতরণ কোম্পানিতে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঘ) বাপবিবোর সার্বিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয়, সহযোগিতা এবং তদারকির দ্বারা পরিচালিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ পূর্ববৎ কাজ করতে থাকবে এবং প্রয়োজনানুসারে আরো নতুন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠন করা;

(ঙ) ইন্টারনেট নেটওয়ার্কসহ রিমোট রিডিং, মনিটরিং এন্ড কন্ট্রোলের মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৫.৩.৫। বাণিজ্যিক সম্পর্ক

বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণের পৃথকীকরণ সূচিত হলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা তাদের উৎপাদিত সমস্ত বিদ্যুৎ একক ক্রেতার নিকট বিক্রয় করবে, যে প্রতিষ্ঠান বিতরণকারী সংস্থার নিকট এ বিদ্যুৎ বিক্রয় করবে।

৬। কর্মচারী সংক্রান্ত বিষয়াদি

৬.১। সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যে সকল সমস্যা রয়েছে, তা সঠিকভাবে আমলে নিয়ে, সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত মর্মে সরকার স্বীকার করে।

৬.২। সংস্কার কর্মসূচি চলাকালীন, এ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরও গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে এবং বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠনের সময় তাদের মতামতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

৬.৩। সংস্কার প্রক্রিয়ার সময় বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্বার্থ যেন সংরক্ষণ করা হয়, সে বিষয়ে সরকার নিম্নরূপভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করবে:

(ক) পুনর্গঠনের অব্যবহিত পূর্বে চাকুরির যে শর্তাদি ছিল, তা, পুনর্গঠনের পর বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পূর্বের বেতন ও আর্থিক সুবিধাদির চেয়ে কোন অংশে কম হবে না;

(খ) প্রতিক্ষেত্রেই কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে;

(গ) বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠনের পূর্বে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে চাকুরির যে সকল সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছিল, পুনর্গঠন পরবর্তী সময়ে সেগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং চাকুরি হতে অবসর গ্রহণকালে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে এগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

৭। ট্যারিফ

ট্যারিফ কাঠামোটি নিম্নবর্ণিত নিয়ামক দ্বারা নির্দেশিত হবে:

(ক) ট্যারিফ'কে ধীরে ধীরে সমন্বয় করা হবে এবং দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিফলন করতে হবে;

(খ) দক্ষতা, সম্পদের মিতব্যয়ী ব্যবহার, কর্মসম্পাদন এবং সর্বোত্তম বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এমন সকল প্রভাবক;

(গ) গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে এবং একই সাথে তারা বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য যৌক্তিকভাবে মূল্য পরিশোধ করবে;

(ঘ) বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং সরবরাহ বাণিজ্যিক নীতির ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে;

(ঙ) বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা;

(চ) সময় ভেদে ট্যারিফ নির্ধারণ বলবৎ থাকবে। পিক আওয়ারে অপ্রয়োজনীয় খাতে বিদ্যুতের অপচয় কমানোর ক্ষেত্রে এই নীতি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা আনয়ন সহজ হবে।

৮। বিদ্যুৎ খাতের নিয়ন্ত্রণ

একটি কার্যকর এবং দায়বদ্ধ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন চলতে থাকবে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সংক্রান্ত আইন এ সময় নাগাদ প্রবর্তন করা হবে। বিদ্যুৎ খাত পরিচালনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মডেল নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বিদ্যুৎ খাতের অংশীদারদের সাথে পর্যায়ক্রমিক আলোচনার মাধ্যমে, নিয়ন্ত্রণকারী সকল বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৈরি করা হবে। বিদ্যুৎ খাতের গাঠনিক কাঠামোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। এ কাঠামোকে আরো পরিমার্জিত করতে হবে, যেন তা বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে কার্যকর হতে পারে। ভবিষ্যতে এ কাঠামোকে আরো স্থিতিশীল করা, ক্রমান্বয়ে এর মান উন্নীতকরণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। কীভাবে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে, তা সবিস্তারে নির্ধারণ করতে হবে।

৮.১। নিয়ন্ত্রণকারী কমিশন বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উভয় খাতের বিধিবিধানকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

৮.২। এ নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনঃ

(ক) মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সর্বনিম্ন ব্যয়ে বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণ ও পরিচালন, এবং যৌক্তিক ট্যারিফ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে; এবং

(খ) বিদ্যমান এবং নতুন বিনিয়োগকারীগণের এই খাতকে আকর্ষণীয় করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯। আর্থিক পুনর্গঠন

পুনর্গঠিত সংস্থাগুলোকে দায়-দেনা মুক্ত অবস্থায় কার্যক্রম শুরুকরার সুযোগ দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে সংস্থাগুলোর সম্পদ এবং দেনার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে এবং এই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসংস্থান করতে হবে।

১০। বাস্তবায়ন

চলমান পদক্ষেপসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যুৎখাতের সংস্কার এবং পুনর্গঠনের জন্য একটি সংশোধিত এবং হালনাগাদ কর্মসূচি প্রস্তুত করা হবে, যেখানে বস্তুনিষ্ঠ সময়সীমা এবং অন্তবর্তী সকল পদক্ষেপকে বিবেচনায় নেওয়া হবে। এর অনুসরণে বিদ্যুৎ খাতের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা একটি সময়াবদ্ধ কর্মসম্পাদন/ ফলাফল নির্ভর বাস্তবায়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করবে। নিয়মিত এ প্রক্রিয়াটির নিরীক্ষণ করা হবে।